Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture's
Volume – 3, Issue-III, published on July 2023, Page No. 146 – 152
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: trisangamirj@gmail.com
(SJIF) Impact Factor 5.115, e ISSN : 2583 – 0848

সুন্দরবনের শ্রমজীবী নারীদের সংগ্রাম : প্রসঙ্গ ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প

রিয়া পারভিন
গবেষক, কাজী নজরুল বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল : riyaafreen890@gmail.com

Keyword
নোনা গাঙ, সুন্দরবন, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, মরশুমের জীবিকা, প্রান্তিক নারী, সংগ্রামী নারী, পরিত্যক্তা ও বিধবা নারী, পরিযায়ী নারী।

Abstract
কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জনজীবন ও সংস্কৃতিকে ধ্রী কেন্দ্রে রেখে সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হয়েছেন। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মন্ড হারবারে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা এবং এখানেই তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। কর্মসূত্রে তাঁকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হয়েছে বিভিন্ন সময়। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর চোখে দেখা ঘটনাকেই অবলম্বন করেছেন সাহিত্যে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এখনও পর্যন্ত দুশোর বেশি ছোটোগল্প এবং চোদ্দটি উপন্যাস লিখেছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাকে অবলম্বন করে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ছোটোগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- বাস্তবতার উলঙ্গ রূপ খুঁজে বের করা। তাঁর গল্পে দেখা যায় মানুষের জীবনব্যবস্থার নিঁখুত প্রতিচ্ছবি। চট্টোপাধ্যায় গল্পের চরিত্ররা প্রায় প্রত্যেকেই নিম্নশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই মানুষগুলির জীবনব্যবস্থাকে দেখাতে গিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহের দিকটিকে তুলে ধরেছেন অর্ধশতাধিক গল্পে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় গল্পে জীবিকা একটা বড়ো স্থান জুড়ে আছে। তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রীদের জীবিকা অর্জনের দিকগুলি পাঠককে আকর্ষণ করবে নিঃসন্দেহে। ব্যাং, হাড়, ডিম, কাঁকড়া, মধু, কাঠ, জ্বালানি কাঠ, মাছ প্রভৃতি ব্যবসা করে দিনাতিপাত করে বাদা অঞ্চলের মানুষেরা। 'তাতারসি', 'জলঘড়ি', 'চরবুড়ো', 'নুন', 'তেলমাসি', 'কলকাতার পাহাড়', 'রাত প্রহরী', 'বাসন্তীর পাঁচালি গানে নতুন পালা' ইত্যাদি গল্পগুলিতে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় জীবিকা নির্বাহের এক নতুন দিগন্তকে দেখিয়েছেন। যে জীবিকা পদ্ধতির কথা অনেক মানুষের প্রায় অজানা। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় সেই সব জীবিকাকেই দেখিয়েছেন তাঁর গল্পগুলির ভেতর। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মানুষের জীবন ও জীবিকাকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তা এককথায় অনবদ্য।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে নারী-পুরুষের যৌথ মিথস্ক্রিয়াকে দেখিয়েছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের ভেতর নারী-পুরুষের বৈষম্যকে গল্পকার কোথাও দেখাননি। তবে নারী-পুরুষের স্বভাবধর্মকে আবার আড়ালও করেননি। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের নারী চরিত্ররা প্রায় প্রত্যেকেই হয় বিধবা, না হয় স্বামী পরিত্যক্তা। তাই বাধ্য হয়ে এই নারীদেরকে নিজেদের সংসার পরিচালনার জন্য বেরোতে হয় সমাজের অন্দরমহল থেকে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে দেখা যায় নারীরা কোনো সময়েই তাদের সংসারের উপর বোঝা হয়ে যায় নি। তারা নিজেদের প্রয়োজন যেমন নিজেরাই মিটিয়েছে, সেই সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সেই হিসেবে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের নারীরা কারোর প্রতি নির্ভর নয়, বরং সমাজের একটা অংশ তাদের উপর আস্থা রাখতে বাধ্য হয়েছে।

Discussion

পশ্চিমবঙ্গের ২৩টি জেলার মধ্যে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা একটা অন্যতম জেলা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমভূমির দক্ষিণ অঞ্চলের গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের অংশ যা বঙ্গীয় অববাহিকার সমুদ্রের প্রান্তিক অঞ্চলে অবস্থিত। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার থেকে বিশেষ কয়েকটি দিক থেকে স্বতন্ত্র। এই জেলার ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতির দিকে মনোযোগী হলে এর সদর্থক উত্তর পাওয়া যাবে। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সিংহভাগই গ্রাম কেন্দ্রিক। শুধু গ্রাম বললে একটু ভুল হবে, এই জেলার বসবাসকারী অধিবাসীরা যেন আদমের প্রথম বংশধর। প্রায় সভ্যতার আলোকবর্জিত সুন্দরবনের দ্বীপগুলিতে বসবাসকারী মানুষদের সমাজ-সংস্কৃতি এবং জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি ও প্রকরণ দেখলে তা জানা যাবে। কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার জনজীবন ও সংস্কৃতিকে ধ্রী কেন্দ্রে রেখে সাহিত্য রচনায় মনোযোগী হয়েছেন। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার ডায়মন্ড হারবারে ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। এখানেই তাঁর বেড়ে ওঠা এবং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাতেই তিনি কর্মজীবন শুরু করেন ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে। কর্মসূত্রে তাঁকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার বিভিন্ন অঞ্চলে যেতে হয়েছে বিভিন্ন সময়ে। এমনকি সাহিত্য রচনার তাগিদে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় হাঁটুরেদের মতো ঘুরে বেড়িয়েছেন সুন্দরবনের এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর চোখে দেখা ঘটনাকেই অবলম্বন করেছেন সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এখন পর্যন্ত দুশোর বেশি ছোটোগল্প এবং ১৪ টি উপন্যাস লিখেছেন দক্ষিণ চব্বিশ পরগণাকে অবলম্বন করে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল- বাস্তবতার উলঙ্গ রূপ খুঁজে বের করা। বাস্তব জীবনের খোঁজ পেতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানা দরকার সেই অঞ্চলের মানুষদের যাপিত জীবন ব্যবস্থার ক্রমপর্যায়টি। তাঁর গল্পে দেখা যায় মানুষের জীবন ব্যবস্থার নিঁখুত প্রতিচ্ছবি। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের চরিত্ররা প্রায় প্রত্যেকেই নিম্নশ্রেণির প্রতিনিধিত্ব করেছে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই মানুষগুলির জীবনব্যবস্থাকে দেখাতে গিয়ে তাদের জীবিকা নির্বাহের দিকটিকে তুলে ধরেছেন অর্ধশতাধিক গল্পে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে জীবিকা একটা বড়ো স্থান জুড়ে আছে। তাঁর গল্পের পাত্র-পাত্রীদের জীবিকা অর্জনের দিকগুলি পাঠককে আকর্ষণ করবে নিঃসন্দেহে। ব্যাং, হাড়, ডিম, কাঁকড়া, কাঠ, জ্বালানি কাঠ এবং বাগদা-মীন প্রভৃতি সংগ্রহ করে দিনাতিপাত করে বাদা অঞ্চলের মানুষেরা।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর ছোটোগল্পে নারী-পুরুষের যৌথ মিথস্ক্রিয়াকে দেখিয়েছেন। সুন্দরবন অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের ভেতর নারী-পুরুষের বৈষম্যকে গল্পকার কোথাও দেখাননি। তবে নারী-পুরুষের স্বভাবধর্মকে আবার আড়ালও করেননি। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের নারী চরিত্ররা প্রায় প্রত্যেকেই হয় বিধবা, না হয় স্বামী পরিত্যক্তা। তাই বাধ্য হয়ে এই নারীদেরকে নিজেদের সংসার পরিচালনার জন্য বেরোতে হয় সমাজের অন্দরমহল থেকে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পে দেখা যায় নারীরা কোনো সময়েই তাদের সংসারের উপর বোঝা হয়ে যায় নি। তারা নিজেদের প্রয়োজন যেমন নিজেরাই মিটিয়েছে, সেই সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদেরও দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। সেই হিসেবে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের নারীরা কারোর প্রতি নির্ভর নয়, বরং সমাজের একটা অংশ তাদের উপর

আস্থা রাখতে বাধ্য হয়েছে। আমরা এই গবেষণা পত্রটিতে সংক্ষেপে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পে সুন্দরবনের প্রান্তিক শ্রমজীবী নারীদের সংগ্রাম নিয়ে আলোচনা করবো।

প্রাকৃতিক সম্পদের জন্য সুন্দরবনের একটা বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। সুন্দরবনের প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগাবার উদ্দেশ্যে একদল মানুষ বিশেষ মরশুমে বসতি গড়ে তোলে সুন্দরবন উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলিতে। সুন্দরবন উপকূলবর্তী অঞ্চলে খেজুর রস দিয়ে গুড় তৈরি প্রাচীন একটা জীবিকা সংস্থানের মাধ্যম। এই জীবিকাকে কেন্দ্র করে একদল মানুষ বিভিন্ন গ্রামাঞ্চল থেকে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বঙ্গোপসাগর উপকূলবর্তী দ্বীপগুলিতে সাময়িক বসতি স্থাপন করে। মরশুম শেষ হয়ে গেলে তারা আবার নিজেদের ঘরে ফিরে যায়। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'তাতারসি' (পরিচয়, ১৯৮৪ খ্রিস্টাব্দ) গল্পে খেজুর রসের মৌসুমের অস্থায়ী আবাসের সংঘর্ষপূর্ণ জীবনের প্রতিচ্ছবিকে দেখিয়েছেন। স্বামী পরিত্যক্তা পারুল, তাঁর ছোটো বোন নীরা ও বৃদ্ধ বাবা অভিরামের জীবিকা নির্বাহের গল্প 'তাতারসি'। গল্পটি শুরু হয়েছে সুন্দর একটা চিত্রকল্প দিয়ে:

> "শীতের রাত। রাত কেটে ভোর ফুটতে এখনো দেরি। উত্তরের হাওয়ায় অন্ধকার আরও ঘন হয়ে জমে আছে। সামনে পুকুরটা চুপচাপ। সাত বিঘের জলকর, ডাকনাম বড় পুষ্করণী। চওড়া পাড়ে লম্বা চেহারায় ডাব নারকেল, পশ্চিমে গায়ে গা-লাগিয়ে খান চল্লিশেক খেজুর গাছ। চেরা পাতায় শেষ রাতের হিমে ভিজে নেয়ে সপসপে। একটাও পাখি পক্ষির সাড়া নেই। হিম বরফ হাওয়ায় সব কুঁকড়ে কামড়ে গুটিসুটি।"[১]

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় কত মাপের একজন শিল্পী। গল্পের শুরুতে দেখা যায় ভোর থাকতে থাকতে পারুল বাবার সঙ্গে বেরিয়ে যায় রস সংগ্রহ করার জন্য। খেজুর রস সংগ্রহ করে পারুল ও অভিরাম ঘরে আসে। তারপর সেই রস জ্বাল দিয়ে পারুল তৈরি করে নলেন গুড় এবং সেই গুড় চালান যায় শহরের বাজারে। গুড় তৈরি হলে বাজারে বিক্রি করতে যেতে হয় অভিরামকে। সেই গুড় বিক্রি হলে তবেই অন্নের যোগান হবে।

শীতের মরশুম গল্পে একদিকে যেমন অর্থ উপার্জনের সুযোগ এনে দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে পারুলের যৌবন তারুল্যের উচ্ছ্বাস একাকিত্ব জীবনকে ভারাক্রান্ত করেছে। গল্পে দেখা যায় বারে বারে পারুলের অসহায়ত্বের সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে কিছু অসৎ মানুষ। তবুও পারুল নিজেকে বিকিয়ে যেতে দেয়নি।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'তাতারসি' গল্পে পারুল চরিত্রটির মাধ্যমে সুন্দরবন উপকূলবর্তী অঞ্চলের নারীদের জীবিকা অর্জন ও সংগ্রামকে দেখিয়েছেন। এই নারীদের জীবিকা উপার্জন করতে কতটা সংগ্রাম করতে হয় পারুল চরিত্রটির মাধ্যমে তা জানা যায়। সমাজে নারী যে অসহায় এবং তারা পুরুষের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল তা ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের নারীদের মধ্যে দেখা যায় না। পারুল বৃদ্ধ বাবার কষ্টকে লাঘব করার জন্য সংসারের হাল ধরেছে নির্দ্বিধায়। পুরুষের লালসা তাঁকে বারবার আঘাত করলেও সে তাঁর লক্ষ্য থেকে সরে যায়নি। গল্পে শেষে জলমাপা গরমেন্টের সঙ্গে পারুলের একান্ত দৃশ্যটি গল্পটিকে ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। সংগ্রামী এই নারী তাঁর নিজের পছন্দের মানুষকে নিজেই নির্বাচন করতে চায়। যা নিঃসন্দেহে প্রান্তিক অঞ্চলের নারীদের মধ্যে একটা বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের জীবিকা কেন্দ্রিক আরেকটি গল্প 'সমুদ্র গন্ডি' (অমৃত পত্রিকা, ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ)। গল্পটি ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম দিকের লেখা। নারী সংগ্রাম ও মেহনতি নারীর বিজয়ের গল্প 'সমুদ্রগন্ডি। গল্পটিতে চরিত্রের ভিড় নেই। মুখ্য চরিত্র টুসকি, সে অবিবাহিতা। টুসকি বন বিভাগের চোরায় কাঠ সংগ্রহ করে সংসার চালায়। টুসকির বাবা সুন্দরবনের গভীরে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে আর ফিরে আসেনি। টুসকি তাঁর জীবন একাকী কাটাতে থাকে। বনের কাঠ বেচে যে উপার্জন হচ্ছিল তাতে টুসকির জীবন ভালোই চলে যাচ্ছিল। কিন্তু এই উপার্জনের পথে বাধা পড়ে। ফরেস্টের আরদালি বলে –

> "আজ তুমি কাঠ কটা নিয়ে যাও- কাল থেকে আর নয়।"[২]

টুসকি এই শুনে কিছুটা ভয় পেলেও তাতে তাঁর চিন্তা আসেনি। চিন্তা আসলো তখনই যখন কাঠের আড়তদার গিরিবাবু বলে সে আর কাঠ কিনবে না কারো কাছ থেকেই। গল্প শেষে তাঁর করুন উপলব্ধি-

> "টুসকির বুকের মধ্যে সমুদ্রে পাল ছেঁড়া নৌকো ডুবি মানুষের আঁকুপাঁকু। এতো বড় বালিচরে দুটো পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকার জায়গা পাচ্ছে না। ...বালিচরের পরে আর এক পাও হাঁটা যাবে না, সামনে জল রেখার বিরাট গন্ডি। ঢেউ। অসংখ্য শাসন।"[৩]

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'সমুদ্রগন্ডি' গল্পে জীবিকা সংকটের দিকটিকে দেখাতে গিয়ে নিঃসঙ্গ টুসকির জীবন সংগ্রামকে পাঠকের সামনে উপস্থিত করেছেন। নারী জীবনের অসহায়ত্বের দিকটিকে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই গল্পে নিখুঁতভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কথা সাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় দক্ষিণবঙ্গকে এক অন্য রূপে তুলে ধরেছেন বাঙালি পাঠকের কাছে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনায় দক্ষিণবঙ্গের নানান দিক নিয়ে সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করেছেন। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'জলঘড়ি' (অনুক্ত, চৈত্র ১৯৭৯) গল্পটি তারই কিছুটা পাদ পূরণ করবে। জলঘড়ি বা water clock প্রাচীনকালের একটা সময় পরিমাপক পদ্ধতি। এই গল্পে ইটভাটার নারী শ্রমিকদের জীবনের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সময়গুলি একসূত্রে গেঁথেছেন গল্পকার।

'জলঘড়ি' গল্পের প্রধান চরিত্র মঞ্জুরি। মঞ্জুরি স্বামী পরিত্যক্তা নারী। পেটের তাড়নায় হেডমিস্ত্রির সঙ্গে মাস ছয়েকের জন্য ইটভাটাতে কাজ করতে এসেছে। এখানে অবশ্য আরও ৬৬ জন কর্মচারী আছে। গল্পে মঞ্জুরির একমাত্র আপন বলা মানুষ দুশো বা দুঃশাসন। দুঃশাসনের সঙ্গেই তাঁর বোঝা পড়া। সুখ-দুঃখের নানান গল্পের একমাত্র আশ্রয় এই দুঃশাসনই। মঞ্জুরি তাই বলে-

> "আমরা তো কাদা চটকিয়ে শেষ। কত লোকে এই ইটে ঘর বাঁধে। বউ পুরুষ নিয়ে সংসার করে- বলতে বলতে দু'চোখে আগুন আলোয় চিকচিক করে। চকিতে দুঃশাসনের হাতটা শক্ত করে ধরে মঞ্জুরি।"[৪]

সেও চায় পছন্দ মতো এক মানুষ, যার সঙ্গে সে ঘর বাঁধতে পারে। কিন্তু অদ্ভুত পৃথিবীতে সব কিছু মনের মতো হয় না, হয় না বলেই আজও পৃথিবীতে আকাঙ্ক্ষা বেঁচে আছে। সেই আকাঙ্ক্ষারই অতৃপ্তি দেখা যায় মঞ্জুরির মধ্যে।

গল্পকার এই গল্পে প্রান্তিক নারীদের হতাশা ক্লিষ্ট, স্নেহ-প্রেম বঞ্চিত দারিদ্রতার জীবনপঞ্জিকেই লিপিবদ্ধ করেছেন সময় সারণির মাইল ফলকে। হতভাগ্য সমাজের নিম্নবর্গের শ্রমজীবী নারীদের অপূর্ণতা থেকে পরিপূর্ণতায় পৌঁছানোর গল্প জলঘড়ি। সেই সঙ্গে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় এই গল্পে মঞ্জুরি ও মহাদেবের বউয়ের মাধ্যমে সুন্দরবন উপকূলবর্তী অঞ্চলের শ্রমজীবী নারীদের সংগ্রামকে দেখিয়েছেন। এই নারীরা পেটের দায়ে ঘর ছেড়ে ইটভাটার কাজে আসতে বাধ্য হয়েছে।

সুন্দরবনের নারীদের জীবনাবৃত্তে সংগ্রাম যেন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'সেরা ৫০ টি গল্প' সংকলনের অন্তর্গত 'ঘেরি' (বারোমাস, ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দ) ও 'হাড়' (সমতট, ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দ) গল্পে সেই ছাপ স্পষ্ট। ঘেরি একটা বড় দিঘি বিশেষ। কয়েক বিঘা থেকে কয়েক'শো বিঘা জমি নিয়ে এই ঘেরি তৈরি করা হয় মাছ চাষের জন্য। এই ধরনের ঘেরিকে কেন্দ্র করেই সুন্দরবনের অনেক মানুষের জীবিকা সুনিশ্চিত হয়। ঘেরি গল্পে দেখা যায় বিধবা মালা একটা ঘেরি লিজে নিয়েছে। ঘেরিতে কাজ করার জন্য অনেক শ্রমিকের প্রয়োজন হয়, বিশেষত নারী শ্রমিকের। এই ঘেরিতে যারা কাজ করে তাদের প্রায় প্রত্যেককেই স্বামী পরিত্যক্তা অথবা বিধবা। ঘেরি গল্পের মূলত দুটি দিক উঠে এসেছে।

১. সমাজে নারীর অবস্থান ঠিক কোন জায়গায়।

২. স্বাবলম্বী নারী।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় ঘেরি গল্পে অবহেলিত, বঞ্চিত নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার দিকটিকেই গুরুত্ব সহকারে দেখিয়েছেন।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'হাড়' গল্পে দেখা যায় পুঁটির জীবনের নানান দিক। পুঁটির স্বামী বিয়ের কিছু দিনের মধ্যেই পুঁটিকে ছেড়ে চলে যায়। এরপর পুঁটি নিজের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করে। পুঁটি ভাগাড়ে ভাগাড়ে গিয়ে হাড় সংগ্রহ করে। আর সেই হাড় রাতের অন্ধকারে বিক্রি করতে যায় নৌকায় থাকা হরিমিস্ত্রির কাছে। হরি মিস্ত্রি হাড়ের ব্যবসাদার। পুঁটির সঙ্গে হরির ব্যবসায়িক সূত্রে একটা সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে। সে সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত প্রেমে গড়িয়ে যায়। পুঁটি তাঁর

নিঃসঙ্গ জীবনে পেয়ে যায় আশার আলো। পুঁটি স্বামী পরিত্যক্তা হলেও বিধবার মতো থান পড়ে। কেন পরে, তা আমাদের বুঝতে অসুবিধা হয় না। সমাজের চোখে নারীদের অবস্থান যে সুনিশ্চিত নয়- তা পুঁটির মাধ্যমে জানা যায়। মানুষের জীবনে অন্ন-বস্ত্র, বাসস্থান গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর সেই উপকরণগুলি সংগ্রহ করতে মানুষ বাধ্য। তাই পুঁটি নিজেকে টিকিয়ে রাখতে জীবন সমরে জড়িয়ে পড়েছে নানাভাবে নানা দিক থেকে। তাই সমাজের চোখে ফাঁকি দিয়ে রাতের অন্ধকারে পুঁটি ছুটে যায় হাড় বিক্রি করার জন্য।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পগুলিতে জীবিকার রকমারি দেখা যায়। সেই সঙ্গে এই জীবিকার সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষগুলির সংগ্রামও লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে তাঁর গল্পে শ্রমজীবী নারীদের জীবন সংগ্রাম পাঠককে ভাবিয়ে তোলে। এমনি এক গল্পের নাম 'নুন' (বন্দর, ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দ)। সুন্দরবন উপকূলবর্তী দাশপুর দ্বীপের অভাবগ্রস্ত বিধবা বড় খুকির পরিবারের নুন প্রস্তুত, নুন বিক্রির করুণ কাহিনিই 'নুন' গল্পে মুখ্য হয়ে উঠেছে। জঙ্গলে কাঠ সংগ্রহ করতে গিয়ে বড় খুকির স্বামী বাঘের শিকার হয়। স্বামী মারা যাওয়ার পর বড় খুকি বাবার বাড়িতে চলে আসে। বাবা-মায়ের অভাবের সংসারে বড় খুকি বোঝা হয়ে দাঁড়ায়। তারপর হঠাৎ করে বড় খুকির বাবা রতন অসুস্থ হয়ে পড়লে সংসারে তীব্র অভাব দেখা দেয়। বড় খুকি এবং তাঁর মায়ের তৈরি করা নুন'ই তাদের জীবিকা নির্বাহের একমাত্র উপায়। সেই নুন বাজারে বিক্রি করতে পারলে তবেই সংসারের অন্নের যোগান এবং অসুস্থ বাবার চিকিৎসা করা সম্ভব হবে। সেই জন্য প্রাণের ভয় না করে বর্ষার দিনে বড় খুকি উৎপাদিত আধমন নুন নদীপথে বাজারে বিক্রি করতে যায়। এরপর নেমে আসে বিপর্যয়। মাঝ সমুদ্রে নৌকা দমকা হাওয়ায় দুলে ওঠে। শুরু হয় মুষলধারে বৃষ্টি, নৌকা আছাড় খায় জলের উপর। মাঝি নৌকায় উপস্থিত সবাইকে বোঝা খালি করার জন্য বলে। বাধ্য হয়ে সবাইকে তাই করতে হয়। সেই সঙ্গে বড় খুকিকেও বিসর্জন দিতে হয় তাঁর মায়ের কষ্টে তৈরি করা নুন। রোজকারের শেষ সম্বলটুকু তাঁকে হারাতে হয়-

> "মারা নুনের বস্তা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে বড় খুকির চোখ চুঁইয়ে দু ফোঁটা লোনা জল টপে পড়ে মিশে মিলিয়ে গেল লোনা ঢেউয়ে। মনে মনে বলে বড় খুকি, মা গঙ্গা, তোমার লোনা মাটির নুন গুলান তুমি সব লিলু। তোমার নোনা জলে কি গলা ভিজেনি.....!"[৫]

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'নুন' গল্পে সুন্দরবন উপকূলবর্তী অঞ্চলের নারীদের জীবন সংগ্রামকে বড় খুকি চরিত্রটির মাধ্যমে তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। অভাবে সংসারে সামান্য নুনের কী মূল্য তা বড় খুকির আচরণে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বড় খুকি নুন বেচে তাঁদের অভাবের সংসারে পান্তার ব্যবস্থা করতে চেয়েছে। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে নোনা গাঙের উন্মত্ততায়। বড় খুকি সংসারের হাল ফেরাতে নিজের সবটুকু উৎসর্গ করেছে। বড় খুকিকে পাঠক তাঁর এই সংগ্রামী মনোভাবের জন্য শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারে না।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় যেহেতু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রান্তিক মানুষদের জীবন নিয়ে সাহিত্য রচনা করেছেন, সেই জন্য তাঁর গল্পে গ্রামীণ সমাজ চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। গ্রামে এখনো মানুষ নানা দিক থেকে পিছিয়ে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'তেলমাসি' (আজকাল রবিবার, ২০১০ খ্রিস্টাব্দ) গল্পে গ্রাম-মফস্বলের মানুষদের জীবনযাত্রার পরিবর্তনের সেই দিক ফুটে উঠেছে। সেইসঙ্গে উঠে এসেছে তেলমাসি কল্পনা জাতুয়ার জীবিকা নির্বাহের দিকটি। কল্পনার জীবিকা নির্বাহই গল্পে মুখ্য বিষয়। কল্পনা বিয়াল্লিশ-তেতাল্লিশের স্বামী পরিত্যক্তা মধ্যবয়সী নারী। কল্পনা এই বয়সে শক্ত কাজ করতে পারে না। তাই পেট চালাবার জন্য বাড়ি বাড়ি কেরোসিন তেল সংগ্রহ করে। এরপর সেই তেল কিছুটা লাভ রেখে বিক্রি করে ইটভাটার পরিযায়ী শ্রমিকদের কাছে। সভ্যতার অগ্রগতিতে মানুষ যে আজ উন্নত জীবনযাপন করছে তেলমাসি গল্পে তারই আভাস দিয়েছেন গল্পকার। গ্রাম সংলগ্ন মফঃস্বলের মানুষদের ঘরে বিদ্যুৎ আছে, রান্নার গ্যাস আছে তার জন্য রেশনের থেকে পাওয়া কেরোসিন তেল তারা আর ব্যবহার করে না। এই তেল মজুদ করে বাড়ির কর্ত্রীরা বিক্রি করে কল্পনাদের মতো তেলমাসিদের কাছে। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় তেলমাসি গল্পে জীবিকার পাশাপাশি গ্রাম মফস্বলের বর্তমান পরিস্থিতিকে দেখিয়েছেন। সভ্যতার আধুনিকীকরণে সাধারণ মানুষের যেমন লাভ হয়েছে প্রভূত; তেমনি উপকার হয়েছে নানা পেশায় থাকা মানুষদের।

মানুষের পেট যদি না থাকতো তাহলে নাকি পৃথিবী বিকল হয়ে পড়তো। কারণ পেটের জন্যই মানুষ সব ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে বাধ্য হয়। এই কথা আংশিকভাবে সত্য। কারণ বর্তমানে মানুষ কেবলমাত্র পেটের জন্য

নিজের জীবনকে বিপদসংকুল করে না। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানান দিক। তবে দরিদ্র শ্রেণির মানুষদের পেট চালানোই মুখ্য উদ্দেশ্য। কোনো মতে দুবেলা দু-মুঠো খেয়ে পরে টিকে থাকাটাই তাদের উদ্দেশ্য। আর তার জন্য তাদের মধ্যে নানান জীবিকার পথ অবলম্বন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 'বাসন্তীর পাঁচালি গানে নতুন পালা' (একুশ শতক, ২০০৬ খ্রিস্টাব্দ), 'তিন হাত আকাশ' (শারদীয় নন্দন, ২০০৩ খ্রিস্টাব্দ) গল্প দুটি। 'বাসন্তীর পাঁচালি গানে নতুন পালা' গল্পের প্রধান চরিত্র বাসন্তী স্বামী পরিত্যক্তা দুই সন্তানের মা। তাঁর স্বামী তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে অনেক আগেই। তাই সংসার চালাতে, ছেলে মেয়েদের মানুষ করতে বাসন্তীকে কাজের সন্ধান করতে হয়। বাসন্তী ছোটোবেলায় গ্রামের পালাগান, কেচ্ছা-কাহিনি শুনে শুনে মুখস্ত করে নিয়েছিল বাবা জেঠার কাছ থেকে।

> "তখন আমি ফ্রক চাপিয়ে ওই ইস্কুলতলায় সন্ধেয় চুপি চুপি হাজির হতুম, জানালা ধরে জ্যাঠাদের মুখে পালাগান শুনতুম, নগেনদাও পার্ট বলত--"[৬]

পরবর্তীতে এই পালাগানই তাঁর অর্থ যোগানের মাধ্যম হয়ে ওঠে। পালা গায়িকা হিসেবে আস্তে আস্তে গ্রামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে বাসন্তী। বাইরে থেকেও ডাক আসে তাঁর। বাসন্তী একটা দল তৈরি করে নিজের পরিবারের সঙ্গে বেশ কয়েকটা পরিবারের অন্ন যোগানের দায়িত্ব নেয়। বাসন্তীর এই জনপ্রিয়তা একদিনে তৈরি হয়নি, বহু সংগ্রামের পর অনেক কষ্ট স্বীকার করে, গঞ্জনা সহ্য করে বাসন্তী নামের চারা গাছটি মহীরূহে পরিণত হয়ে একাধিক পরিবারকে ছায়া দিয়েছে।

'তিন হাত আকাশ' গল্পে রয়েছে নারীর সংসারের প্রতি দায়বদ্ধতা। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বাড়ির প্রধানা বীণা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করেছে। বীণা মধ্যবয়সী বিধবা। কর্ম যোগ্য ছেলে থাকলেও বীণাকে কাজে বেরোতে হয়। কারণ ছেলের স্বল্প আয়ে সংসার চলে না। বীণা স্থানীয় একটা মুরগির দোকানে কাজ করে। কাজের মজুরি সে নেয় না। মুরগি কেটে বিক্রি করার উপযোগী করে দেওয়ার পরিবর্তে মুরগির অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি থাকে তা বাড়ি নিয়ে আসে এবং সেগুলি ঘরে এনে গরম জলে ধুয়ে পরিষ্কার করে, প্রতিবেশী বনলতাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে। বনলতা তা আবার বাজারে বিক্রি করে। বীণাকে মজুরি না দিয়েও তাঁর মালিক সলেমানের যথেষ্ট মুনাফা থাকলেও সলেমান বীণাকে নানা ভাবে হেনস্তা করে –

> "ছোকরা মালিক দাঁত খিঁচোয়, এই বীণা বউদি— এসব দু-নম্বরি কাজ কেন?
> -- কি ভাই?
> -- তুমি যেমনি বিনি মজুরিতে মাংস কেটে দিচ্ছ তেমনি তো ছাট, ঠ্যাং, পালক, নাড়িভুঁড়ি ব্যাগ বোঝাই করে ফাঁকতা কলে নে যাচ্ছ, নাকি?"[৭]

বীণার এই অসহায়ত্ব পাঠককে আঘাত করে। কেননা বীণার এই দাবি অন্যায় নয়। সে টাকা না নিয়ে মুরগির অবশিষ্ট অংশ দাবি করেছে, তাতে সলেমানের কোনো অসুবিধার থাকার কথা নয়। আসলে দুর্বলের প্রতি সবল অত্যাচারকে দেখিয়েছেন গল্পকার বীণা সলেমানের মাধ্যমে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার প্রান্তিক মানুষদের জীবনযাত্রাকে যেভাবে সাহিত্যে রূপদান করেছেন তা এক কথায় অনবদ্য। বিশেষত সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে সঙ্গে যেভাবে তাদের পেশাকে দেখিয়েছেন তা প্রশংসার যোগ্য। মানুষের জীবনযাত্রার মান নির্ভর করে তার পেশার ওপর। তাই পেশা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মনুষ্য সমাজে। এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনা করা হল তাতে বোঝা যায় সুন্দরবনের শ্রমজীবী নারীদের জীবনে কতটা চড়াই-উতরাই চলে প্রতিনিয়ত। স্বাধীন ভারতে আমাদের দেশের নারীরা যে স্বাধীন নয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তবে ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের গল্পের নারী চরিত্ররা যেভাবে সংগ্রাম ও প্রতিবাদ করে নিজের পথ আবিষ্কার করেছে তা পাঠকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করে। বাঙালি পাঠক এই নারীদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল না হয়ে পারে না।

তথ্যসূত্র :

১. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর. শ্রেষ্ঠ গল্প, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০০৪, পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৯. পৃ. ২৫

২. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর. 'রমণী ও পুরুষ', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪. পৃ. ১০
৩. তদেব, পৃ. ১৪
৪. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর. 'কাঠকুটো', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০১৮. পৃ. ২৩৭
৫. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর. স্বজন প্রিয়জন, কলকাতা, সোপান, প্রথম প্রকাশ, পৃ. ৮০
৬. চট্টোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর. 'সেরা ৫০ টি গল্প', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ২০১১. পৃ. ২৮৬
৭. তদেব, পৃ. ২৪৩